Note By Hafijul capitalism a ghost story By Arundhati Roy

সরমর্মঃ ভারতে কিছু কর্পোরেট ও ধনী ব্যক্তির হাতে বিপুল সম্পদ জমা হচ্ছে, আর বিপরীতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ দারিদ্র্য ও বঞ্চনায় ভুগছে। সরকার ও রাষ্ট্রের সহযোগিতায় কর্পোরেটরা প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানুষের জমি দখল করছে, কিন্তু এই তথাকথিত 'উন্নয়ন' আসলে গরিবদের জন্য কোনো স্থায়ী সুযোগ তৈরি করছে না।

গণতন্ত্র, মিডিয়া, বিচারব্যবস্থা সব জায়গাতেই কর্পোরেটদের প্রভাব বাড়ছে। তারা নানা শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা ও এনজিওর মাধ্যমে নিজেদের ভালো দেখানোর চেষ্টা করে, অথচ আসলে মানুষের অধিকার ও প্রতিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। ফলে, ভারতের সমাজে একদিকে ধনী-গরিবের ব্যবধান বেড়েই চলেছে এবং সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। এই বৈষম্য ও কর্পোরেট আধিপত্যের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার ও ন্যায়ের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে—এটাই লেখাটির মূল বার্তা।

ভূমিকাঃ মুম্বাইয়ে মুকেশ আম্বানির ২৭ তলা বাড়ি 'অ্যান্টিলা' যেন নয়া ভারতের এক রহস্যময় প্রতীক। এর বিলাসবহুল আয়োজন (তিনটি হেলিপ্যাড, ৬০০ চাকর) আর দেয়ালের শুকিয়ে যাওয়া ঘাসের এই বৈপরীত্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, অর্থনীতির 'চুইয়ে পড়া' (Trickle-down) তত্ত্ব এখানে পুরোপুরি ব্যর্থ।

কিন্তু উল্টোদিকে 'গাশ-আপ' (Gush-Up) বা সম্পদ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রক্রিয়া দারুণভাবে কাজ করছে। এর ফলেই আজ ভারতের ১০০ জন ধনী ব্যক্তির হাতে দেশের মোট জিডিপির এক-চতুর্থাংশের সমান সম্পদ জমা হয়েছে। শোনা যায়, এত কিছুর পরেও আম্বানি পরিবার ভূতের ভয়ে বা দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় ওই বাড়িতে থাকে না। কার্ল মার্ক্স হয়তো একেই বলেছিলেন, "পুঁজিবাদ এমন এক জাদুকর, যে নিজের মন্ত্রে ডেকে আনা শক্তিকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।"

এই ব্যবস্থার আসল ভূতেরা হলো সেই আড়াই লক্ষ ঋণগ্রস্ত কৃষক, যারা আত্মহত্যা করেছে, এবং সেই ৮০ কোটি দরিদ্র মানুষ, যাদেরকে দিনে ২০ টাকারও কম খরচে জীবন কাটাতে হয়। আজ ভারত আসলে চালায় কয়েকটি কর্পোরেশন—আম্বানি, টাটা, জিন্দাল, বেদান্ত। খনি, তেল, গ্যাস থেকে শুরু করে মিডিয়া পর্যন্ত সবকিছুই তাদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের বিপুল সম্পদের

উৎস দুটি: এক, প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করা এবং দুই, 'উন্নয়নের' নামে গরিবদের জমি কেড়ে নেওয়া। অথচ এই 'উন্নয়ন' দেশের ৯০% মানুষের জন্য কোনো স্থায়ী চাকরি তৈরি করে না।

এর ফলে রাজনৈতিক আন্দোলনও বদলে গেছে। আগে আন্দোলন হতো ভূমিহীনদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের জন্য, আর এখন আন্দোলন হয় শুধু নিজের সামান্য জমিটুকু বাঁচানোর জন্য। এই বিপুল অর্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে—আদালত, সংসদ, মিডিয়া—ভেতর থেকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর সেরা উদাহরণ হলো ২জি স্পেকট্রাম কেলেঙ্কারি, যেখানে ফাঁস হওয়া ফোনালাপ প্রমাণ করে দেয় কীভাবে শিল্পপতি, মন্ত্রী আর সাংবাদিকরা মিলে দেশের সম্পদ লুঠ করেছে। এটি যেন সেই রোগের এক এমআরআই রিপোর্ট, যা সাধারণ মানুষ অনেক আগেই ধরে ফেলেছিল।

সম্পদের বেসরকারিকরণ এবং রাষ্ট্রের যুদ্ধ: ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ, যেমন পাহাড়, নদী ও অরণ্য, কর্পোরেশনগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যা এক ভয়াবহ যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করেছে। এই বিষয়টি আর্থিক কেলেঙ্কারির মতো সহজে বোঝা যায় না বলে বা 'দেশের উন্নতি'র নামে ধামাচাপা দেওয়া হয় বলে এটি নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না।

২০০৫ সাল থেকে ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ডের সরকারগুলো বিভিন্ন কর্পোরেশনের সাথে গোপন চুক্তি করে জলের দরে দেশের খনিজ সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছে। এই চুক্তিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকার মাওবাদী দমনের নামে সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই যুদ্ধের কয়েকটি নির্মম উদাহরণ:

- **ভূমি দখলের অভিযান:** খনি কর্পোরেশনগুলোর টাকায় এবং সরকারের অস্ত্রে 'সালওয়া জুডুম'-এর মতো সশস্ত্র বাহিনী তৈরি করা হয়, যারা শত শত গ্রাম পুড়িয়ে, ধর্ষণ ও হত্যা করে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মানুষকে উচ্ছেদ করেছে।
- **অপারেশন গ্রিন হান্ট:** এই অভিযানের নামে মধ্য ভারতে হাজার হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সেনাবাহিনীকে তার সবচেয়ে দরিদ্র মানুষদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে।
- **কলিঙ্গনগরের হত্যাকাণ্ড:** উড়িষ্যায় টাটা স্টিল প্ল্যান্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় পুলিশ গুলি চালিয়ে ১৩ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে।

- **সোনি সোরির উপর নির্যাতন:** বস্তারের আদিবাসী শিক্ষিকা সোনি সোরিকে মাওবাদী হিসেবে স্বীকার করানোর জন্য পুলিশি হেফাজতে পাশবিকভাবে নির্যাতন করা হয়, অথচ নির্যাতনকারী পুলিশ অফিসার পরে বীরত্বের জন্য পুরস্কৃত হন।

এই ধ্বংসযজ্ঞের খবর সামনে আসে না, কারণ গণমাধ্যমের একটি বড় অংশ কর্পোরেটদের বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভরশীল অথবা নিজেরাই খনি ব্যবসার সাথে সরাসরি জড়িত।

এই ধ্বংসযজ্ঞ শুধু মধ্য ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়। অরুণাচলে শত শত বাঁধ তৈরি হচ্ছে, গুজরাটে 'কল্পসার'-এর মতো অবাস্তব প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং দিল্লি-মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর (DMIC)-এর মতো বিশাল প্রকল্পের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষের উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। গুজরাটে ২০০২ সালের গণহত্যার রক্তের দাগ ঢাকার জন্যই যেন বিশাল বিনিয়োগের আয়োজন করা হয়, যাকে 'ব্লাড মানি' বলা চলে। এভাবেই 'উন্নয়নের' নামে দেশজুড়ে এক নীরব যুদ্ধ চলছে।

উপলব্ধি ব্যবস্থাপনা ও কর্পোরেট বদান্যতা: গরিবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো এক জিনিস, কিন্তু মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের দমন-পীড়ন দিয়ে বশ করা যায় না। তাদের জন্য প্রয়োজন **'উপলব্ধি ব্যবস্থাপনা'** বা মন বদলের খেলা। আর এখানেই কর্পোরেট বদান্যতা বা দানের শিল্পটি কাজে আসে।

আজকাল বড় বড় খনি কর্পোরেশনগুলো শিল্প-সাহিত্য উৎসবের পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছে। যেমন, বেদান্ত বা জিন্দালের মতো সংস্থা, যাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ ধ্বংস ও জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে, তারাই চলচ্চিত্র বা শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করে নিজেদের এক উদার ও মানবিক চেহারা তুলে ধরে। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো জয়পুর সাহিত্য উৎসব। সেখানে টাটা স্টিলের মতো সংস্থা প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে থাকে। উৎসবে বাকস্বাধীনতা নিয়ে বড় বড় কথা হয়, কিন্তু সেই পৃষ্ঠপোষকদের হাতে উচ্ছেদ হওয়া বা নিহত হওয়া মানুষদের কথা কেউ বলে না। এটি আসলে তাদের 'ইস্পাতের চেয়েও শক্তিশালী মূল্যবোধ' নয়, বরং নিজেদের আসল চেহারা ঢাকার একটি কৌশল।

কিন্তু আমরা সবাই এই জালে আটকা পড়েছি। আমরা টাটার নুন খাই—তাদের পরিষেবা ব্যবহার করি, তাদের জিনিস কিনি। তাই এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলার নৈতিক অধিকার যেন আমাদেরও নেই। সেই অধিকার কেবল তাদেরই আছে, যাদের কণ্ঠস্বর ইতিমধ্যেই স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে—জঙ্গলের সেইসব মানুষ, যাদের খবর কখনো গণমাধ্যমে আসে না।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: কর্পোরেট বদান্যতার উৎস: এই কর্পোরেট বদান্যতার ধারণাটি নতুন নয়। এর শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সে সময়ের টাটা বা আম্বানি অর্থাৎ কার্নেগি এবং রকফেলারের মতো শিল্পপতিরা তাদের বিপুল মুনাফা থেকে 'ফাউন্ডেশন' তৈরি করেন। এই ফাউন্ডেশনগুলো ছিল এক অসাধারণ কৌশল—এগুলো করমুক্ত, কিন্তু এদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক মুনাফাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

রকফেলার ফাউন্ডেশন জাতিসংঘ, সিআইএ এবং কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস (সিএফআর)-এর মতো প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান তৈরিতে অর্থায়ন করেছে। বিশ্বব্যাংকের বেশিরভাগ প্রেসিডেন্টই সিএফআর-এর সদস্য ছিলেন। অর্থাৎ, যে সংস্থাগুলো গরীবদের ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয়, তাদের নিয়ন্ত্রণ আসলে কর্পোরেট জগতের হাতেই। বিল গেটস কীভাবে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হয়েও সারা বিশ্বের শিক্ষা বা স্বাস্থ্য নীতি নির্ধারণ করেন, তার উত্তর এখানেই লুকিয়ে আছে।

চিলির বিখ্যাত কবি পাবলো নেরুদা তার 'স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানি' কবিতায় এই সত্যটিই তুলে ধরেছিলেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে কর্পোরেশনগুলো দেশ, সরকার, এমনকি মানুষের আত্মাকেও কিনে নেয়।

শেষ পর্যন্ত, কর্পোরেট বদান্যতাই ইতিহাসের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এটি কোনো গোপন ষড়যন্ত্র নয়, বরং ক্ষমতার এক জটিল ও খোলাখুলি খেলা। কর্পোরেশনগুলো যেভাবে বিভিন্ন কোম্পানির মাধ্যমে টাকা লেনদেন করে, ঠিক সেভাবেই এই ফাউন্ডেশনগুলো বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার লেনদেন করে।

জ্ঞান, মতাদর্শ ও এনজিও: বিশ্ব শাসনের অদৃশ্য জাল: নন্দন নিলেকানি বা বিল গেটসের মতো প্রযুক্তিবিদরা এমনভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করেন, যেন মনে হয় তথ্যের অভাবই বিশ্বের ক্ষুধার কারণ—উপনিবেশবাদ, ঋণ বা কর্পোরেট শোষণ নয়।

এই ধারণাটি ছড়ানোর মূল কারিগর হলো কর্পোরেট-প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশনগুলো। তারা সামাজিক বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সবচেয়ে বড় অর্থায়নকারী। তারা তৃতীয় বিশ্বের মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যায়। এই ছাত্ররাই পরে নিজেদের দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা আমলা হয়ে দেশের অর্থনীতিকে বিশ্ব কর্পোরেশনগুলোর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়।

যেসব পণ্ডিতেরা এই ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলেন, তারা পান বিপুল অনুদান ও পুরস্কার। আর যারা বিরোধিতা করেন, তাদের একঘরে করে রাখা হয়। ধীরে ধীরে, কর্পোরেটদের তৈরি করা এই নির্দিষ্ট ভাবধারাটিই একমাত্র সত্য বা 'স্বাভাবিক নিয়ম' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বিরুদ্ধাচরণ করাটা তখন অবাস্তব বলে মনে হতে থাকে। এভাবেই জন্ম নেয় "এর কোনো বিকল্প নেই" (There is No Alternative) ধারণাটি।

এই ব্যবস্থার আরেকটি শক্তিশালী হাতিয়ার হলো **এনজিও**। আইএমএফ যখন বিভিন্ন দেশের সরকারকে স্বাস্থ্য বা শিক্ষার মতো খাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য করে, তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসে কর্পোরেট-অর্থায়িত এনজিওগুলো। অর্থাৎ, 'সবকিছুর বেসরকারিকরণের' অর্থ 'সবকিছুর এনজিওকরণ'।

যদিও কিছু এনজিও ভালো কাজ করে, তবে এই ব্যবস্থাটি আসলে প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায়। এই এনজিওগুলো সরকারের জন্য **'শ্রবণকেন্দ্র'** (listening posts) হিসেবে কাজ করে—তারা সাধারণ মানুষের তথ্য সংগ্রহ করে রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী করে। একারণেই, যে অঞ্চলে সরকারের বিরুদ্ধে অস্থিরতা যত বেশি, সেখানে এনজিওর সংখ্যাও তত বেশি।

নিয়ন্ত্রণের কৌশল: বর্ণবাদ থেকে বর্ণপ্রথা এবং কর্পোরেট বদান্যতার নতুন রূপ: কর্পোরেট ফাউন্ডেশনগুলো একই কৌশল দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করেছিল। তারা আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (ANC)-কে সমর্থন করে উগ্রপন্থী

আন্দোলনগুলোকে শেষ করে দেয়। ফলে, নেলসন ম্যান্ডেলা যখন রাষ্ট্রপতি হন, তখন তাকে ‘শান্তিপূর্ণ উত্তরণ’-এর নামে ওয়াশিংটনের অর্থনৈতিক নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়—কোনো ভূমি সংস্কার বা খনি জাতীয়করণ নয়, বরং বেসরকারিকরণ। আজ, একদল প্রাক্তন বিপ্লবী দেশটি শাসন করে, যা ‘কৃষ্ণাঙ্গ মুক্তি’-র এক কল্পকাহিনী মাত্র।

একই ঘটনা ঘটছে ভারতের দলিত আন্দোলনের ক্ষেত্রে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘ব্ল্যাক পাওয়ার’ আন্দোলনের মতোই, ‘দলিত পাওয়ার’-কেও খণ্ডিত করে এখন ‘দলিত পুঁজিবাদ’-এ পরিণত করা হচ্ছে, যা মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সুবিধা দিলেও কোটি কোটি দলিতদের কোনো উপকারে আসছে না। এর ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। দলিত নেতা ডঃ আম্বেদকর অনেক আগেই বুঝেছিলেন যে, ভারতের বর্ণবাদী সমাজে কমিউনিস্টদের শ্রেণি-সংগ্রামের তত্ত্ব অচল, কারণ কমিউনিস্ট পার্টি নিজেও বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্ত ছিল না।

আজ ভারতেও কর্পোরেট বদান্যতার এই মডেল পুরোদমে চলছে। টাটা, জিন্দাল, আম্বানিরা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (যেমন অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন বা ORF) তৈরি করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে ‘অর্থনৈতিক সংস্কার’-এর কথা বলে, অন্যদিকে রেথিয়নের মতো অস্ত্র প্রস্তুতকারক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্ব করে। প্রশ্ন জাগে, যুদ্ধের জন্য কি আমাদের অস্ত্র প্রয়োজন, নাকি অস্ত্রের বাজার তৈরির জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন?

এই সবকিছুর পেছনে রয়েছে নতুন এক স্নায়ুযুদ্ধ, যেখানে ভারতকে মার্কিন মিত্র হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু পুঁজিবাদ নিজেই আজ গভীর সংকটে। তার পুরনো কৌশল—যুদ্ধ আর কেনাকাটা—আর কাজ করছে না, কারণ এটি এই গ্রহকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

লেখাটি শেষ হয় অ্যান্টিলার প্রতীকে ফিরে এসে। ‘অ্যান্টিলা’ এক পৌরাণিক দ্বীপের নাম, যা এক বিচ্ছিন্ন সভ্যতার প্রতীক। আম্বানির এই বাড়িটিও যেন ভারতের দারিদ্র্য থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণির বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার স্বপ্ন। এটি ভারতের সবচেয়ে সফল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন—মহাকাশে ধনীদের পলায়ন। অ্যান্টিলার উজ্জ্বল আলো যেমন রাতের অন্ধকার চুরি করে নেয়, তেমনি এখন সময় হয়েছে সেই রাতকে ফিরিয়ে নেওয়ার।